বাংলাদেশে পারমানবিক বিদ্যুৎ ও কিছু প্রাসঙ্গিক ভাবনা

গত ২রা নভেম্বর,২০১১ তারিখে বাংলাদেশ ও রাশিয়ার মধ্যে পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন সংক্রান্ত এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তিতে বাংলাদেশের পক্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী ইয়াফেস ওসমান এবং রাশিয়ার পক্ষে রাষ্ট্রীয় আনবিক শক্তি সংস্থা(ROSATOM)-এর মহাপরিচালক সের্গেই কিরিয়েঙ্কো সাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুযায়ী রাশিয়া বাংলাদেশের পাবনার ঈশ্বরদীর রূপপূর-এ ১০০০ মেগাওয়াটের দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র তৈরি করবে। চুক্তির বিস্তারিত প্রকাশ করা না হলেও বলা হয়েছে এই বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সর্বোচ্চ নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকায় এতে কোন ধরনের দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা নেই। এই প্রকল্পের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছে প্রায় ১.৫-২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আশা প্রকাশ করা হয়েছে ২০১৪ সালের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শুরু করা হবে এবং ২০১৮ সালের মধ্যে অন্তত একটি কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। বর্তমানে আমাদের বিদ্যুৎ ঘাটতি দৈনিক প্রায় ১৫০০ মেগাওয়াট। এই বিদ্যুৎ ঘাটতি পূরনের জন্যে যৌক্তিক ও কার্যকরি উদ্যোগকে আমরা অবশ্যই সাধুবাদ জানাবো। কিন্তু বর্তমান বাস্তবতায় পারমানবিক বিদ্যুৎ -এর ব্যয়, পরিচালনা, নিরাপত্তা, বর্জ্য-ব্যবস্থাপনা এবং আমাদের দেশে এই প্রযুক্তি পরিচালনার প্রয়োজনীয় দক্ষতা নিয়ে কিছু যৌক্তিক প্রশ্নের সমাধান জরুরী। আমরা এখানে পারমানবিক বিদ্যুৎ কি এবং এর ব্যয় ও ব্যবহার নিয়ে কিছু প্রাসঙ্গিক আলোচনা করার চেষ্টা করব।

পারমানবিক বিদ্যুৎ কি? অধিকাংশ বিদ্যুৎ কেন্দ্রই চলে স্টীম টারবাইনে, যেখানে জ্বালানি পুড়িয়ে পানিকে বাস্পে পরিনত করা হয়। সেই বাস্প টারবাইনকে ঘুরায়। এই টারবাইনের সাথে জেনারেটর লাগানো থাকে। টারবাইন ঘুরলে জেনারাটর ঘুরে এবং বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রেও ঠিক একই প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। শুধু বাস্প তৈরির জন্য যে প্রচুর পরিমান তাপ প্রয়োজন হয় তা আসে পারমানবিক বিক্রিয়া থেকে। যে ভেসেলে বা পাত্রে এই বিক্রিয়া ঘটানো হয় তাকে বলে রিয়াক্টর। আর এই বিক্রিয়ার জ্বালানি হল ইউরেনিয়াম। ইউরেনিয়াম আবার ২ প্রকার। ইউরেনিয়াম-২৩৫, ইউরেনিয়াম-২৩৮। জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হয় ইউরেনিয়াম-২৩৫। কিন্তু প্রকৃতিতে যে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায় তাতে মাত্র ০.৭২ শতাংশ থাকে ইউরেনিয়াম-২৩৫। বাকিটা ইউরেনিয়াম-২৩৮। অথচ পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য যে ধরনের ইউরেনিয়াম প্রয়োজন সেখানে কমপক্ষে ৩ থেকে ৫ শতাংশ ইউরেনিয়াম-২৩৫ থাকতে হবে। এজন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-২৩৮ পরিমান কমিয়ে ইউরেনিয়াম-২৩৫ এর পরিমান বৃদ্ধি করা হয়। একে বলে ইউরেনিয়াম এনরিচমেন্ট। একটা ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমানুকে ভাঙলে ২টি ভিন্ন পদার্থ, ২টি বা ৩টি নিউট্রন এবং প্রচুর তাপ উৎপন্ন হয়। নতুন ২টি নিউট্রন আবার আরো ২টি ইউরেনিয়াম কে ভাঙ্গে। এভাবে এটা ক্রমাগত বাড়তেই থাকে এবং প্রচুর পরিমানে তাপ পাওয়া যায়। এটাকে চেইন রিয়াকশন বলে। কিন্তু অনিয়ন্ত্রিত চেইন রিয়াকশন বিশাল পরিমানে তাপ উৎপন্ন করবে যা বড় ধরনের দুর্ঘটনার সৃষ্টি করবে। এজন্য চেইন রিয়াকশন কে সঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রন করা প্রয়োজন। এই নিয়ন্ত্রনের মুলনীতি খুব সহজ। প্রতিটি ইউরেনিয়াম-২৩৫ পরমানু ভাঙ্গার সময় যে ২ অথবা ৩ টি নিউট্রন পাওয়া যায়, তারাই চেইন রিয়াকশন শুরু করে। সুতরাং যদি নিউট্রন গুলোকে কোন ভাবে সরিয়ে ফেলা যায় তাহলেই তো রিয়াকশনের গতি নিয়ন্ত্রন করা যাবে। এই নিউট্রন গুলোকে সরানোর জন্য Boron বা Silver-indium-cadmium সংকরের রড ব্যবহার করা করা হয়। এসব রড মুক্ত নিউট্রন শোষন করতে পারে। এই রডকে বলে কন্ট্রোল রড। প্রয়োজন অনুযায়ি কন্ট্রোল রড মুল রিয়াক্টর বা বিক্রিয়াস্থলে প্রবেশ করানো যায়। আবার বের করা যায়। যখন কন্ট্রোল রড বেশি পরিমানে ঢুকানো থাকবে তখন অধিকাংশ নিউট্রন অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। ফলে খুব কম পরিমান ইউরেনিয়াম-২৩৫ ভাঙবে এবং কম তাপ উৎপন্ন হবে। আবার যখন কন্ট্রোল রড অল্প পরিমানে ঢুকানো থাকবে তখন কম পরিমান নিউট্রন অ্যাবজর্ব হবে, বাকিরা বিক্রিয়াতে অংশ নেবে। ফলে প্রচুর ইউরেনিয়াম-২৩৫ ভাংবে এবং বিশাল পরিমানের তাপ উৎপন্ন হবে। এভাবে প্রয়োজন অনুযায়ি কন্ট্রোল রড কে নিয়ন্ত্রন করে সঠিক পরিমানে তাপ উৎপাদন করা সম্ভব। আর প্রয়োজন অনুযায়ি সঠিক পরিমানে তাপ উৎপাদন করা গেলে, সাধারন স্টীম টারবাইনের মাধ্যমেই বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভব। পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে বাষ্পকে টারবাইনে ব্যবহারের পর কুলিং টাওয়ারের মাধ্যমে পানিতে পরিণত করে আবার রিয়েক্টরে ফেরত পাঠানো হয়। প্রয়োজনে অতিরিক্ত বাষ্প চিমনি দিয়ে বের করে দেওয়া হয় ও নতুন পানি বাহির থেকে সরবরাহ করা হয়। চুল্লীর মধ্যে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় যেসব তেজস্ক্রিয় পার্টিকেল প্রস্তুত হয় তারমধ্যে Deuterium ও tritium

অন্যতম। এগুলো পানির হাইড্রোজেন পরমাণুর সাথে নিউট্রন যুক্ত হয়ে সৃষ্টি হয়। কোন কারণে রিয়েক্টর বন্ধ করে দিলেও কয়েকদিন পর্যন্ত রিয়েক্টরের ভেতর উচ্চ তাপমাত্রা থাকে। কারণ পারমাণবিক বিক্রিয়া হঠাৎ করে সম্পূর্ণ থামিয়ে দেয়া যায় না। তাই রিয়েক্টর বন্ধ করে দিলেও ডিজেল জেনারেটর অথবা ব্যক আপ জেনারেটর দিয়ে পাম্প চালিয়ে রিয়েক্টরে পানির প্রবাহ সচল রাখা হয়। ডিজেল জেনারেটর কাজ না করলে ব্যাটারি ব্যাবহার করে পাম্প সচল রাখারও ব্যবস্থা আছে। এই পানির প্রবাহ যদি কোন ভাবে বন্ধ হয়ে যায়, তবে রিয়েক্টরের তাপমাত্রা কোনভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না, ফলে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে। উল্লেখ্য, সাম্প্রতিক কালে (18 March, 2011) জাপানের ফুকুশিমা পারমাণবিক চুল্লি একই সাথে প্রচন্ড ভূমিকম্প ও সুনামির আঘাতে মারাত্নকভাবে ক্ষতিগ্রস্থের কারণে বিকল্প পাম্পগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় চুল্লিতে পানি সরবরাহ সচল রাখা সম্ভব হয়নি। যার ফলে অতিরিক্ত তাপমাত্রার কারণে বিস্ফোরণ ঘটে। পানির ব্যবহারের তারতম্যের উপর ভিত্তি করে পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রকে দুইভাগে ভাগ করা যায়: Pressurized Water Reactor ও Boiling Water Reactor। এখানে আমরা পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কিভাবে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় সে সম্বন্ধে একটি সাধারন ধারনা পেলাম। কিন্তু রূপপূর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোন প্রক্রিয়ায় বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হবে সে সম্বন্ধে সুস্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি, শুধু হলা হয়েছে এতে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি অনুসরণ করা হবে। আমরা যতদূর জানি ROSATOM কর্তৃক প্রয়োগকৃত সর্বাধুনিক প্রযুক্তি হচ্ছে VVER-1000 যা আসলে Pressurized Water Reactor (PWR) এর একটি আধুনিক রূপ। ROSATOM-এর পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে এই প্রযুক্তিতে কোন ধরনের দূর্ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই, এটি ১০ মাত্রার ভূমিকম্প এবং ভারী যাত্রীবাহি বিমানের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু তাদের এই দাবি কতটুকু যৌক্তিক তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। কারন বিখ্যাত পরিবেশবাদী সংগঠন GREENPEACE তাদের প্রকাশনায় vver-1000 সিরিজের নিউক্লিয়ার পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর বেশ কিছু কারিগিরি ত্রুটির কথ উল্লেখ করেছে এবং এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভারী যাত্রীবাহি বিমানের আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা নিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন তুলেছে । GREEN PEACE-এর দাবি অনুযায়ি এই ধরনের রিয়েক্টর ৭০-এর দশকের জার্মান প্রযুক্তিতে নির্মিত রিয়েক্টরের চেয়েও অনিরাপদ। এছাড়া ভারতের তামিলনাড়ুর KOODANKULAM পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র-এ স্থাপিত এই সিরিজের রিয়েক্টর নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক আছে। এর বিভিন্ন কারিগরি ত্রুটি, যেমন-ভেসেলের Material of construction ভঙ্গুর হওয়ার সম্ভাবনা, দূর্ঘটনায় কন্ট্রোল রডগুলো কাজ না করার সম্ভাবনাসহ আরও বেশকিছু কারিগরি ত্রুটির কথা জানিয়ে John Hallam(Nuclear Campaigner, Friends of the Earth Sydney), Uday Kumar(Co- Director of Programs, Institute of Race and Poverty, University of Minnesota), Valdimir Sliviak(Social- Ecological Union, Russia), Profesor Alexey Yablokov (Centre for Russian Environmental Policy) সহ আরও বেশ কজন স্বনামখ্যাত ব্যক্তি কেরালা, তামিলনাড়ু, অন্ধপ্রদেশ এবং নয়াদিল্লির মূখ্যমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লেখেন। এছাড়া তুরস্কের Akkuyu-তে এই ধরনের পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের বিরুদ্ধে স্থানিয় জনগন ও বিশেষজ্ঞদের আপত্তি এখন আন্দোলনে পরিনত হয়েছে।

পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ব্যয়ঃ এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মান খরচ সাধারন বিদ্যুৎ কেন্দ্রের তুলনায় অনেক বেশি। আমাদের দেশে যে ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্র(PWR type) নির্মান হবে সেই ধরনের সাম্প্রতিক কিছু বিদ্যুৎ কেন্দ্রের খরচ আমরা দেখি- ২০০৮ সালে তুরস্কে দুটি AP1000 বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের জন্য Florida Power & Light Company সর্বমোট ১১.৫-১৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার নির্মান ব্যয় হিসেব দেখায়(ক্যাপিটাল কস্ট, কুলিং টাওয়ার কস্ট, ল্যান্ড কস্ট এবং ট্রান্সমিশন কস্ট সহ)। ২০০৮ সালে Florida Progress Energy ঘোষণা করে দুটি AP-1000 সিরিজের ১০০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানে সর্বমোট ১৪ বিলিয়ন ডলার খরচ পড়বে(ক্যাপিটাল কস্ট, কুলিং টাওয়ার কস্ট, ল্যান্ড কস্ট এবং ট্রান্সমিশন কস্ট সহ)। একইভাবে Virgil C. Summer Nuclear Generating Station ১০০০ মেগাওয়াটের দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানে খরচ পড়েছে প্রায় ১০ বিলিয়ন ডলার। উপরের প্রত্যেকটি উদাহারন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি দ্বারা নির্মিত। রাশিয়া বা চীনের কোম্পানিগুলোর খরচ কিছুটা কম। ২০০৯ সালের হিসেবে চারটি AP-1000 চীনা বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুধু নির্মান ব্যয় পড়ে ৮ বিলিয়ন ডলার। রাশিয়ায় Nizhny Novgorod-এ দুটি ১২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানে প্রতিটি বিদ্যুৎ কেন্দ্রের শুধু নির্মান ব্যয় পড়েছে ৩ বিলিয়ন ডলার করে। এর সাথে লাইসেন্সিং ফি, ট্রান্সমিশন কস্টসহ অন্যান্য ব্যয় যোগ করলে তা আরও অনেক বেশি হবে। পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের সময় এবং এর নির্মান খরচ নিয়ে বেশ কিছু দেশের তিক্ত অভিজ্ঞতা আমাদের সামনে আছে। তার কিছু উদাহারন এখানে উল্লেখ করা হল-

ব্রাজিলের ANGRA-1 বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রকল্প ব্যয় ছিল ৩২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটি ৫ বছরের মধ্যে উৎপাদনে যাওয়ার কথা। কিন্তু ১৩ বছর পর এটি উৎপাদনে যায় এবং খরচ হয় প্রায় ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ব্রাজিলের ANGRA-2 বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির প্রকল্প ব্যয় ছিল ১.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এটি ৮ বছরের মধ্যে উৎপাদনে যাওয়ার কথা। কিন্তু ২৬ বছর পর এটি উৎপাদনে যায় এবং খরচ হয় প্রায় ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কানাডার Darlington Nuclear Generating Station কেন্দ্রের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ৭.৪ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, অথচ খরচ হয়েছে ১৪.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ফিনল্যান্ডের Olkiluoto-৩ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের প্রাথমিক ব্যয় ধরা হয়েছিল ৪.১ বিলিয়ন ডলার। নির্ধারিত সময়ের ৩৭ মাস পরে কাজ শেষ হলে দেখা যায় প্রায় ৫০% বেশি ব্যয় হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা বাংলাদেশে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়িত্ব যে সংস্থাকে দেয়া হয়েছে সেই ROSATOM খোদ রাশিয়ার বুকে একই ধরনের(VVER-1000) বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানে অনেক বেশি সময় এবং খরচ নিচ্ছে। রাশিয়ার পরিবেশবাদী সংগঠন ECO DEFENCEএর Co-Chairman Vladimir Slivyak-এর দেয়া তথ্য অনুযায়ি রাশিয়ার মাটিতে এক একটি VVER-1000 সিরিজের বিদ্যুৎ কেন্দ্র বসাতে খরচ পড়ে কমপক্ষে ৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং বাংলাদেশে বসাতে গেলে তা নূন্যতম ১.৫-৪ গুন বেশি খরচ পড়বে। সেই হিসেবে আমাদের প্রতিটি ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মান খরচ পড়বে কম্পক্ষে ৪.৫ বিলিয়ন ডলার(১.৫ গুন ধরলে) বা ৩৩ হাজার কোটি টাকা অর্থাৎ ১০০০ মেগাওয়াটের দুটি বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান করতেই খরচ পড়বে প্রায় ৬৬ হাজার কোটি টাকা। যেখানে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনায় ৫ টি ৫০০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানের খরচ ধরা হয়েছে ৩.৫ বিলিয়ন ডলার। অথচ আমরা দেখলাম রূপপূর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের দুটি ১০০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মান খরচ ধরা হয়েছে মাত্র(!) ১.৫-২ বিলিয়ন ডলার। এটা কিসের ভিত্তিতে এবং এতে কোন কোন ব্যয় অর্ন্তভুক্ত তা কিছুই প্রকাশ করা হয়নি। অথচ জনমনে এমন একটা ধারনা দেয়া হচ্ছে যেন এই ১.৫-২ বিলিয়ন ডলার খরচ করলেই আমরা উৎপাদনে যেতে পারব। এখানে আরেকটি তথ্যও যথেষ্ট সন্দেহ উদ্রেগকারী। আশা প্রকাশ করা হয়েছে রূপপূর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ ২০১৭-২০১৮ সালের মধ্যে সম্পন্ন হবে। অথচ যখন আমরা দেখি একই ধরনের রিয়েক্টর রাশিয়ার মাটিতে বসাতেই কমপক্ষে ৯ বছর সময় লাগে। এক্ষেত্রে সকল ডকুমেন্টেশন এবং লাইসেন্সিং-এর কাজ সম্পন্ন করা ছিল(যা করতে কমপক্ষে ২বছর সময় লাগে)। তাই এই আশাবাদের ভিত্তি কি তা যথেষ্ট প্রশ্নের উদ্রেগ করে পারমানবিক বিদ্যুৎ সম্বন্ধে একটি সাধারণ ধারনা হল এর উৎপাদন খরচ অনেক কম। কিন্তু WIKIPEDIA থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী আমরা দেখতে পাচ্ছি যে পারমানবিক বিদ্যুৎ-এর খরচ বরঞ্চ অন্যান্য বিদ্যুৎ-এর তুলনায় বেশি।

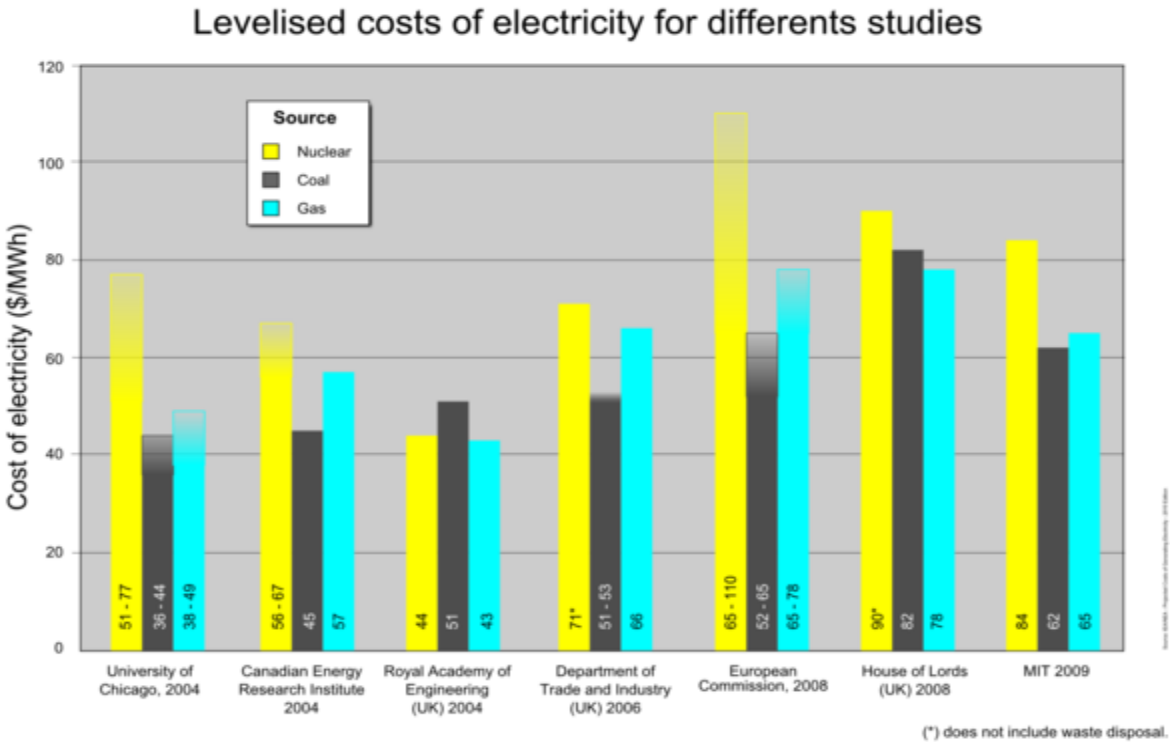

এখানে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্মান খরচ, জ্বালানি খরচ, অপারেশন এবং মেন্টিনেন্স খরচ অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে কিন্তু Decommissioning Costহিসেবে ধরা হয়নি। পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Decommissioning এর জন্যও একটি বড় অংকের বাজেট বরাদ্দ রাখতে হয়। উদাহারনসরূপ- যুক্তরাষ্ট্রের Maine Yankee কেন্দ্র বন্ধের জন্য খরচ হয়েছিল ৬৩৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, Connecticut Yankee কেন্দ্র ব ন্ধের জন্য খরচ হয়েছিল ৮২০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, Exelon -Zion 1 & 2 কেন্দ্র দুটি বন্ধের জন্য খরচ হয়েছিল ৯০০-১১০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। উপরের তথ্য উপাত্তগুলো পারমানবিক বিদ্যুৎ-এর খরচ নিয়ে আমাদের মনে শ্বেতহস্থী পালন করার এক ভয়াবহ আশংকা জাগায়।

পারমানবিক বর্জ্যঃ প্রতিটি পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে গড়ে প্রতি মাসে ২০-৩০ টন উচ্চমাত্রার পারমানবিক বর্জ্য নির্গত হয়। এই পারমানবিক বর্জ্য পরিবেশের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং এর আয়ুস্কাল অত্যন্ত বেশি। পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে নির্গত অতি উচ্চমাত্রার তেজস্ক্রিয় পদার্থের মধ্যে রয়েছে Technetium-99 (হাফ লাইফ ২২০০০০ বছর), iodine-129(হাফ লাইফ ১৫.৭ মিলিয়ন বছর), Neptunium-237(হাফ লাইফ ২ মিলিয়ন বছর), Plutonium-239(হাফ লাইফ২৪০০০ বছর)। সবচেয়ে আশংকার কথা এটাই যে এই পারমানবিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার সঠিক উপায় এখনও আবিষ্কার করা যায়নি। এই সকল পারমানবিক বর্জ্য থেকে ক্যান্সারসহ আরও অনেক জটিল রোগ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ২৯ জানুয়ারি ২০০০ নিউইয়র্ক টাইমস-এর এক রিপোর্টে জানা যায়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আজ পর্যন্ত সেখানে পারমাণবিক অস্ত্র কারখানায় কর্মরত ৬ লাখ মানুষ ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে। এছাড়া অনেকেই জানেন না যে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে ক্ষতিকারক গ্রিনহাউজ গ্যাসও উৎপন্ন হয়। যুক্তরাষ্ট্রে এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য একটি ফান্ড রয়েছে, যার পরিমাণ ২৪ বিলিয়ন ডলার।আমাদের দেশে এর খরচ সমন্ধে কোন ধারনা দেওয়া হয়নি। বলা হচ্ছে ২৫ বছর পর্যন্ত উচ্চমাত্রার পারমানবিক বর্জ্য রাশিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। কিন্তু এই তাদের এই আশ্বাসের পরও পুরোপুরি নিশ্চিন্ত হওয়া যায় না। কারন খোদ রাশিয়ার পরিবেশবাদিরা দাবি করছে যে ROSATOM-এর এই বক্তব্যের মাঝে ফাঁকি আছে। কারন রাশিয়ার আইন অনুযায়ি কেবলমাত্র পুনঃপ্রক্রিয়াজাতকৃত পারমানবিক বর্জ্যই শুধুমাত্র আমদানি করা যাবে, অথচ VVER-1000 সিরিজের বর্জ্য পুনঃপ্রক্রিয়াজাত করার পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত তারা আবিষ্কার করতে পারেনি। আর এই ২৫ বছরে কোন প্রক্রিয়ায় রাশিয়ায় বর্জ্য পাঠানো হবে তা বিস্তারিত বলা হয়নি। ২৫ বছর পরে(এই ধরনের বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Operational life সাধারনত ৩৫ বছর) এর বর্জ্য ব্যবস্থপনা কি হবে তা নিয়েও কিছু বলা হয়নি। এই বর্জ্য নিষ্কাশনের সমস্যা ছাড়া আরও সমস্যা আছে। পারমাণবিক চুল্লীকে ঠাণ্ডা রাখার জন্য তাকে ঘিরে ঠাণ্ডা পানির প্রবাহ চালানো হয় (জাপানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল ওই পানি ঠান্ডা করার প্রযুক্তি বা কুলিং সিস্টেম অচল হয়ে পড়ায়)। যদি কোনোভাবে ওই পানির পাইপে ছিদ্র বা ফাটল সৃষ্টি হয় তাহলে প্রতিদিন চুলস্নীতে ব্যবহৃত বিপুল পরিমাণ পানি তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত হয়ে পড়বে। এর ফলে ওই পানি নিষ্কাশনের জন্য ব্যবহৃত নদী বা সাগরের পানিও দূষিত করবে। জাপানের ফুকুশিমা ও আমেরিকার থ্রি মাইল আইল্যান্ডের ঘটনায় আমরা জানি তেজস্ক্রিয়তাযুক্ত পানি এই মূল পানির প্রবাহের সাথে মিশে আশেপাশের বিস্তীর্ন এলাকার, এমনকি প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারের জনগণকেও বিরাট স্বাস্থ্যঝুঁকির মাঝে ফেলেছে।

দূর্ঘটনাঃ পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সবচেয়ে বড় বিপদ হল নানা রকম দূর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা যা কখনোই উড়িয়ে দেয়া যায় না। ইতিমধ্যে সবচেয়ে আধুনিক প্রযুক্তি ও নিরাপত্তামূলক মান সংরক্ষনকারী দুনিয়ার উন্নত দেশগুলোতেই ছোটবড় মিলিয়ে অসংখ্য পারমানবিক দূর্ঘটনা ঘটেছে। খোদ যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি সংগঠন জরিপ অনুসারে কেবলমাত্র ১৯৮৭ সালেই সে দেশের বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শক্তিকেন্দ্রগুলোতে ২৮১০ টি দূর্ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া ১৯৭৯ সালের পেন্সিল্ভেনিয়ার থ্রি মাইল আইল্যান্ড কেন্দ্রে দূর্ঘটনার ফলে তাৎক্ষনিকভাবে ১ লক্ষ ৪০ হাজার মানুষ তাদের বাসস্থান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এছাড়া ১৯৮৬ সালে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের চেরনোবিল দূর্ঘটনা এযাবৎকালের ইতিহাসে ঘটে যাওয়া সবচেয়ে বড় দূর্ঘটনা। এর ফলে আক্রান্তের সংখ্যা ৭০ লক্ষ, যার মধ্যে এখন পর্যন্ত মারা গিয়েছে ৩০ হাজার মানুষ। সম্প্রতি ঘটে যাওয়া জাপানের ফুকুশিমা দূর্ঘটনায় প্রাথমিকভাবে ৩ জন নিহত হয়। এই দূর্ঘটনার ফলে সেখানকার তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা বহুগুন বৃদ্ধি পায়, যার ফলে কৃষি পণ্য, পানীয়

জল, নদী এবং সাগরের পানি, ভূ-গর্ভস্থ পানি, গৃহপালিত পশু এবং সর্বোপরি বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ব্যাপক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি মাত্রার তেজস্ক্রিয়তার সন্ধান পাওয়া যায়। পারমানবিক

বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ভবিষ্যৎঃ সম্প্রতি জাপানের ফুকুশিমায় ঘটে যাওয়া বিপর্যয়ের পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারমানবিক বিদ্যুৎ-এর ভবিষ্যত নিয়ে নতুনভাবে ভাবা হচ্ছে। উন্নত বিশ্বের বহু দেশ নতুনভাবে পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন না করার ঘোষনা দিচ্ছে। এমনকি বর্তমানে চালু থাকা বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধে বিশাল অংকের বাজেট বরাদ্দ করছে। জার্মানি ২০২২, বেলজিয়াম ২০২৫ এবং সুইজারল্যান্ড ২০৩৪ সালের মধ্যে সকল পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র বন্ধের ঘোষনা দিয়েছে। দূর্ঘটনার পর জাপান পারমানবিক বিদ্যুৎ থেকে সরে আসার ঘোষনা দিয়েছে। এছাড়া তাইওয়ান, বেলজিয়াম সহ আরও বেশ কিছু দেশ পারমানবিক বিদ্যুৎ হতে সরে আসার পরিকল্পনার কথা ঘোষনা করেছে। মোট চাহিদার প্রায় ৭০ ভাগ পারমানবিক বিদ্যুৎ থেকে উৎপাদন করা ফ্রান্সের সরকারও বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো বন্ধ করে দেওয়ার জন্য জনগনের প্রবল চাপের মুখে আছে। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল পৃথিবীড় সবচেয়ে বেশি পারমানবিক বিদ্যুৎ-এর অধিকারি এবং সবচেয়ে বেশি পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মানকারি দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার নিজের দেশে ১৯৯৬ সালের পর থেকে বানিজ্যিকভাবে আর কোন বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান করেনি। এই বিশ্ববাস্তবতায় আমাদের মত একটি দেশে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মান করা কতটুকু যৌক্তিক হবে তা বিবেচনার বিষয়। বিশেষ করে জনসংখ্যার ঘনত্বের দিক দিয়ে শীর্ষে অবস্থনকারী বাংলাদেশের মত তৃতীয় বিশ্বের এক দেশে নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ কেন্দ্রে কোন একটি দূর্ঘটনা যে ভয়াবহ বিপর্যয়ের সূচনা করবে তা কল্পনা করার সাধ্য আমাদেও নেই। ফুকুশিমা দূর্ঘটনার পরে জার্মানির চ্যান্সেলর বলেছেন,'জাপান অত্যন্ত উন্নত শিল্পরাষ্ট্র হওয়া সত্ত্বেও প্রাকৃতিক দূর্যোগের ফলে সংঘঠিত পারমানবিক দুর্ঘটনায় তারা অসহায়'। জাপান এবং জার্মানির মত রাষ্ট্র যদি নিজেদের আনিরাপদ মনে করে তবে কোন দূর্যোগে বাংলাদেশের অবস্থা কল্পনাও করতে পারি না।সবচেয়ে বড় কথা এই প্রযুক্তির কিছুমাত্র আমরা এখনও আয়ত্ত্ব করতে পারিনি। আমাদের দেশের গ্যাস এবং ডিজেল চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো মেরামত করতেই যাখানে বিদেশি প্রকৌশলীদের ডাক পড়ে সেখানে পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে সংঘঠিত কোন একটি দূর্ঘটনায় অপর দেশের প্রযুক্তিবিদদের উপর নির্ভর করা ছাড়া আমাদের কোন উপায় থাকবে না। আমরা বিজ্ঞানের অন্য যেকোন আবিষ্কারের মতো পরমাণু শক্তির ব্যবহারের বিরুদ্ধে নই। কিন্তু এর সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান, দক্ষতা-অভিজ্ঞতা ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা আয়ত্ত্ব করা ছাড়া ব্যবহারের যে ঝুঁকি রয়েছে তা এড়ানোর পক্ষে। এছাড়া আমাদের গ্যাস এবং কয়লার মজুদ যদি আমরা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে পারি তাহলে নিকট ভবিষ্যতে আমাদের কোনো জ্বালানি সমস্যা হওয়ার কথা নয়। কিন্তু আমাদের দেশের শাসকদের যোগসাজসে বহুজাতিক কোম্পানিগুলো গ্যাস ক্ষেত্রসমূহে হস্তগত করছে। দেশের কয়লা সম্পদ নিয়েও নানামুখী চক্রান্ত চলছে। প্রস্তাবিত খসড়া কয়লানীতি এবং মডেল পিএসসি ২০০৮ দুটোতেই যথাক্রমে কয়লা এবং গ্যাস রপ্তানির সুযোগ রাখা হয়েছে। অর্থ্যাৎ আমাদের শাসকদের ইচ্ছা আমাদের নিজেদের সম্পদ ব্যবহার করে সমস্যার দিকে নয় বরঞ্চ তারা একদিকে যেমন দেশের সম্পদ বহুজাতিক কোম্পানিগুলোর হাতে তুলে দিতে চায় অপরদিকে এই সমস্যার সমাধানে বিদেশী পুজিঁ এবং প্রযুক্তি এদেশে ডেকে আনতে চায় শুধুমাত্র নিজেদের দূর্নীতির সুযোগ তৈরি করার জন্য। পারমানবিক বিদ্যুৎ নিয়ে যেসব প্রশ্ন এবং বিভ্রান্তি সাধারন মানুষের মাঝে আছে তার সমাধান না করে তা নির্মানের উদ্যোগ নিলে সেটিও একই ধরনের সন্দেহের উদ্রেগ করবে। আমরা আশা করব সরকারের পক্ষ থেকে অবিলম্বে এই ব্যাপারে সকল বিভ্রান্তি কাটানোর উদ্যোগ নেয়া হবে।